# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ৩০ জুন - ৬ জুলাই ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা 

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
সর্বহারার মহান নেতা

## কমরেড শিবদাস ঘোষ

## জন্মশতবর্ষ পালন করুন

## কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"আমি দেশের বিপ্লবী কর্মীদের, মজুরদের, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে চান, তাঁদের কাছে বলব, এই বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের কাছে থেকেই শিখতে হবে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সফল হয়েছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনে আচার, রুচি, অভ্যাসে আজও বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার, তাদের কাছ থেকে আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না।

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

# দেশভাগের স্মৃতি আনন্দের নয়, যন্ত্রণার

পশ্চিমবঙ্গ দিবস? সেটা আবার কী? শোনামাত্র রাজ্যের প্রায় সব মানুষই এমন প্রশ্ন করেছেন। কারণ এর আগে কখনও এমন দিবসের নাম শোনেননি তাঁরা।

হঠাৎ সংবাদমাধ্যম থেকে রাজ্যের মানুষ জানল যে ২০ জুন কলকাতায় রাজভবনে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করবেন। জানা গেল, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের সব রাজভবনে নির্দেশ পাঠিয়েছে দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করতে। তাই রাজ্যপাল সেদিন রাজভবনে নাচ-গান-বসে আঁকো প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হয়ে গেল কী করে? দিল্লির বিজেপি নেতাদেরই বা হঠাৎ এমন পশ্চিমবঙ্গ-প্রীতির কারণ কী? ইতিহাস বলছে, ১৯৪৭ সালের এই দিনটিতে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় ভোটাভুটি হয়েছিল বাংলা ভাগের প্রশ্নে। সেই বিধানসভায় মুসলিম লিগ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরেই ছিল কংগ্রেসের শক্তি। সিপিআইয়ের ছিল তিনজন সদস্য। হিন্দু মহাসভার একজন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটায়, শিক্ষকদের ভোটে জিতে তিনি আইনসভায় গিয়েছিলেন। ভোটাভুটি সেদিন তিনবার হয়েছিল। সব সদস্যের উপস্থিতিতে যৌথ অধিবেশনের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি মত দেয়— বাংলা অবিভক্ত থাকবে এবং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। পূর্ববঙ্গের মুসলিম প্রধান জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা যে ভোটাভুটি হয় তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে এবং বলে, যদি বাংলা ভাগ হয় তবে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে যোগ দেবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে যে ভোট হয় সেখানে বেশির ভাগ অংশ বাংলাকে দু'ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেয়। বাংলা ভাগের পক্ষে-বিপক্ষে ৫৮-২১ ভোট পড়ে। এই সব ফলাফল বাংলার তৎকালীন গভর্নর ফ্রেডরিক বারোসের কাছে পাঠানো হয়। তিনি তা পাঠান ভাইসরয়ের কাছে।

পশ্চিমবাংলার ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়া ৫৮ জন প্রতিনিধির একজন ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তা হলে বিজেপির দাবি মতো শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের জনক হন কী করে? মূলত মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত যা হওয়ার হয়েছিল। বিজেপি প্রচার করে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে নাকি বাংলার হিন্দুরা সে দিন রক্ষা পেত না। তাদের চলে যেতে হত মুসলিম শাসনে। ইতিহাস থেকে স্পষ্ট, বাংলা

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

*পশ্চিমবঙ্গ দিবস ঘোষণার প্রতিবাদে কলকাতার শ্যামবাজারে দলের উদ্যোগে সভা। ২০ জুন*

## নিন্দার ভাষা নেই

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে সমস্ত রাজ্যের রাজভবনে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উপরাজ্যপালের অফিসে ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস' পালন করা প্রসঙ্গে এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন—

"দেশভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ তৈরির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় উদ্বাস্তু হয়ে দাঙ্গা ও দেশভাগের বেদনা বয়ে বেড়াতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অথচ তা নিয়ে বিজেপি সরকার যে ভাবে সব রাজভবনে আনন্দ-উৎসব করার

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# মণিপুর ঃ ৩০ জুন দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করুন

## জনসাধারণের প্রতি এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বান

মণিপুর পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

৩ মে থেকে মণিপুরে কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি সরকারের পূর্বপরিকল্পনা ও পূর্ণ মদতে যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠেছে, আমরা গভীর আশঙ্কার সাথে তা লক্ষ করছি। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, শতাধিক মানুষের জীবন চলে গেছে। ব্যাপক লুঠতরাজ ও আগুন লাগানো চলছে। গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে আমরা দেখছি, মণিপুর যখন কার্যত জ্বলছে, তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমনকি উদ্বেগ জানিয়ে একটি কথাও বলেননি। বিজেপির 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি অনুযায়ী এবং নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলতে দিচ্ছে। এ জিনিস জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ছাড়া কিছু নয়।

এই দাঙ্গায় কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি সরকারের মদতদাতার ভূমিকার তীব্র নিন্দা করার সাথে সাথে আমরা আবারও দাবি করছি, সাধারণ মানুষের মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য এই সাম্প্রদায়িক জ্বলন্ত পরিস্থিতিকে শক্ত হাতে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

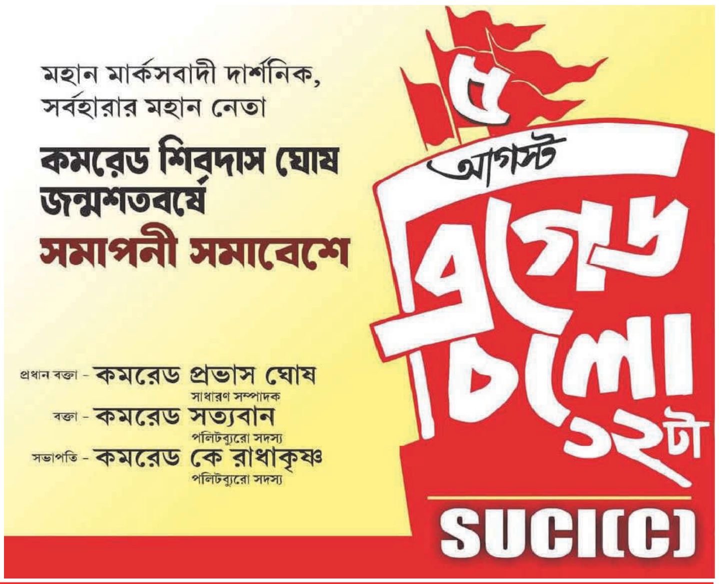

# দেশ ভাগের স্মৃতি যন্ত্রণার

*একের পাতার পর*

ভাগের পিছনে শ্যামাপ্রসাদের আলাদা কোনও ভূমিকা ছিল না। এবং বিজেপি শ্যামাপ্রসাদকে হিন্দুদের ত্রাতা বানাতে যে প্রচার করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অনৈতিহাসিক। অবশ্য বিজেপি জোরের সঙ্গে দাবি করতে পারে, তাদের তাত্ত্বিক নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরই ১৯২৩ সালে প্রথম হিন্দু এবং মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি বলে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তার বহু পরে মুসলিম লিগ ১৯৪২ সালে তাদের এক সম্মেলনে সাভারকরের এই তত্ত্বকেই কাজে লাগায় দেশভাগের পক্ষে তাদের দাবিকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে এবং পরে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে ভাগ করার হাতিয়ার হিসাবে এটাকেই ব্যবহার করে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, চারের দশকের গোড়ায় এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই-ও ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি, এই তত্ত্ব প্রচার করে কার্যত সাভারকরের দ্বিজাতি তত্ত্বকেই সমর্থন করে এবং বাংলাভাগের পক্ষে তাদের তিন জন প্রতিনিধি ভোট দেয়। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে জাতি— এই তত্ত্ব কতখানি ভ্রান্ত তা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আগেই দেখিয়েছেন মহান নেতা স্ট্যালিন। বাস্তবের মাটিতেও বারবার মার্ক্সবাদের এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ প্রমাণিত হয়েছে। ভারতভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান বিরোধী তীব্র ক্ষোভের মধ্যে, যা শেষ পর্যন্ত আলাদা রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম দেয়। ধর্মের ভিত্তিতে যদি জাতি তৈরি হত তবে আরবের মুসলমানদের কিংবা ইউরোপের খ্রিস্টানদের একটি করেই রাষ্ট্র থাকত, আলাদা আলাদা এতগুলি রাষ্ট্রের জন্ম হত না।

দেশভাগের ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার ছিন্নমূল মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা হিন্দুত্ববাদীরা শুরু থেকেই করে আসছে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসার পর সেই চেষ্টা তারা আবার জোর কদমে শুরু করেছে। ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে ২০ জুন দিনটিকে বের করে এনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে চালানোর চেষ্টা সেই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু দেশভাগের মতো একটি স্মৃতি, যা আসলে যন্ত্রণার, তা আনন্দের দিন হয় কী করে? দেশভাগ মানে তো কয়েক যুগ ধরে দেশের কোনও একটি অংশে বাস করা লাখ লাখ মানুষকে ভিটেমাটি, জমি, পরিচিত পরিবেশ, প্রতিবেশী সব কিছু ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে পাড়ি দিতে বাধ্য করা, দেশভাগ মানে তো সর্বস্ব হারানো-লুণ্ঠন-দাঙ্গা-মৃত্যু-যন্ত্রণা-হাহাকার— এর মধ্যে কোথায় আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন বিজেপি নেতারা?

এ ছাড়া ভাগ তো শুধু বাংলাই হয়নি, পাঞ্জাবও ভাগ হয়েছিল। সে রাজ্যে কি পাঞ্জাব দিবস পালনের নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা? কেন দেননি? আসলে বাংলায় দলের সমর্থন বাড়াতে এখন তাদের এমন একটা যে-কোনও দিবসের দরকার যে দিবসটির গায়ে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ লেগে রয়েছে। তা সে ২০ জুন না হয়ে আর একটা যে কোনও দিন হলেও তাদের চলত।

দেশভাগের সেই প্রবল যন্ত্রণাদায়ক ঘা, ছিন্নমূল হওয়া মানুষের মনের মধ্যে যা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে, তাকেই নতুন করে খুঁচিয়ে আবারও দগদগে করে তোলাটা আজ বিজেপির বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অনেক চেষ্টা করেও পশ্চিমবাংলায় জায়গা করতে পারছে না বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন সাধারণ মানুষের বড় অংশের মধ্যে যে চেতনার জন্ম দিয়েছিল, সেই সংগ্রামী চেতনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জায়গা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাকে সে ঘৃণা করেছে, প্রতিরোধ করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিজেপি নেতারা ভালই জানেন, সিপিএমের অবাম রাজনীতি এবং সর্বনাশা সিদ্ধান্ত 'আগে রাম পরে বাম'-এর ফলে এ রাজ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়ী হয়ে গেলেও বাস্তবে তাদের দলের জনসমর্থন তেমন নেই। কেন্দ্রে গত ন'বছরের বিজেপি শাসনে বড় অংশের মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতপাতের বিরোধ— এ সব ছাড়া মানুষকে কার্যত আর কিছুই দিতে পারেনি বিজেপি শাসন। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে নিজেদের সেই অপদার্থতা ঢাকতে এ রাজ্যে হঠাৎ ২০ জুনকে তুলে এনেছে তারা।

রাজ্যের মানুষের পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে অনাগ্রহের বিষয়টি বুঝেই বিজেপি নেতারা রাজভবনকে দিয়ে দিবসটি পালনের সূচনা করেছেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে যদি রাজ্যের মানুষ সাবধান না হন, তবে নানা কায়দায়, মানুষের পুরনো স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক বিজেপি তাদের এই হীন রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে। মানুষকে ভাবতে হবে, এই যে দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মানুষ ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে আসছে, বিজেপির এই ষড়যন্ত্রের আসল লক্ষ্য সেই শান্তি-সুস্থিতিকে নষ্ট করে দেওয়া, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে মানুষের মনকে এমন করে বিষাক্ত করে তোলা, যাতে গুজরাটের মতো, আসামের মতো, উত্তরপ্রদেশের মতো, মণিপুরের মতো প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বুকে ছুরি হানতে পারে, খুন করতে পারে, ঘরদোর জ্বালিয়ে দিতে পারে। আর এই ভাবে বিজেপি তার ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করবে, ক্ষমতার গদিতে গিয়ে বসবে। আমরা কি নিজেদের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হতে দিতে চাই? তা যদি না চাই তবে বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। বিজেপি নেতা-কর্মীদের প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের কোন কল্যাণ-উদ্দেশ্যে তোমরা পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে ইতিহাসের ধুলো ঘেঁটে হাজির করলে? কেন মূল্যবৃদ্ধি-বেকারির বিরুদ্ধে তোমাদের সরকারের কোনও ভূমিকা নেই? সাধারণ মানুষ যখন ক্রমাগত দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, কী করে দেশের মুষ্টিমেয় মানুষ মুনাফার পাহাড় তৈরি করতে পারছে? মানুষের করের টাকায় মন্দির তৈরি করে আর রাষ্ট্রায়ত্ত সব সম্পত্তি ধনকুবেরদের হাতে তুলে দিয়ে কোন কল্যাণটা তোমরা করছ? আমরা সাধারণ মানুষ যদি এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হই, তবে শুধু ২০ জুনেই বিজেপি থামবে না, কাল অন্য একটা দিবস, পরের দিন আর একটা দিবস, যার গায়ে বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে তা খুঁজে বের করবে এবং তাকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্বের, বিদ্বেষের, সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলবে।

বাস্তবে দেশভাগ অনিবার্য ছিল না। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবন বাজি রেখে, তাঁদের আবেগ-মতামত-নিরাপত্তাকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষমতালোভী নেতারা নিজেদের গদি ভাগ-বাঁটোয়ারার স্বার্থে দেশভাগ ডেকে এনেছিলেন। এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তের পরিণতিতে শুধু যে দুই বাংলার অসংখ্য মানুষ সারা জীবনের জন্য ভিটেছাড়া হয়েছেন শিকড় হারিয়েছেন তাই নয়, ভয়াবহ হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন ঘটেছে এবং সম্প্রীতির মাটিতে মানবতার মাটিতে হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার বীজ বাসা বাঁধার সুযোগ পেয়েছে। এই ভয়ানক অপরাধের দায় সেদিনের কংগ্রেস-মুসলিম লিগ-হিন্দু মহাসভা-সিপিআই সহ বড় বড় কোনও দলই অস্বীকার করতে পারে না। তাই আজ দাবি ওঠা দরকার, দেশভাগের ইতিহাস যদি জানতেই হয়, তবে সেই ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত দিনগুলির সত্য ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সম্প্রীতির লক্ষ্যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের একতার লক্ষ্যেই সেই ইতিহাসের চর্চা, পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। আর দিবস যদি পালন করতেই হয়, নেতাজি-ভগৎ সিং-ক্ষুদিরাম সহ বিপ্লবীদের স্মরণে তা পালন করা দরকার, যারা ধর্মের বিভেদহীন শোষণমুক্ত ভারত গড়ার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তা না করে, যারা ভোট রাজনীতির স্বার্থে দেশকে, বাংলাকে ভাগের সর্বনাশা সিদ্ধান্তকে আনন্দ-উদযাপনের বিষয় করে তুলতে চাইছে, তারা মানবতার শত্রু। তাদের সব দিক থেকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। সম্প্রীতির লক্ষ্যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের একতার লক্ষ্যেই সেই ইতিহাসের চর্চা, পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। আর দিবস যদি পালন করতেই হয়, নেতাজি-ভগৎ সিং-ক্ষুদিরাম সহ বিপ্লবীদের স্মরণে পালন করা দরকার, যাঁরা ধর্মের বিভেদহীন শোষণমুক্ত ভারত গড়ার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তা না করে, যারা ভোট রাজনীতির স্বার্থে দেশকে, বাংলাকে ভাগের সর্বনাশা সিদ্ধান্তকে আনন্দ-উদযাপনের বিষয় করে তুলতে চাইছে, তারা মানবতার শত্রু। তাদের সব দিক থেকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।

## জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র জঙ্গিপুর টাউন কমিটির প্রবীণ সংগঠক কমরেড নাকফর মণ্ডল ধনপতনগরে নিজের বাড়িতে ৯ জুন সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল আনুমানিক ১০০ বছর।

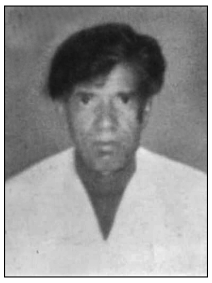

প্রয়াত কমরেড অচিন্ত্য সিংহের মাধ্যমে ১৯৬৪-'৬৫ সালে দলের সংস্পর্শে আসেন তিনি। সেই সময়ে এলাকায় খাদ্য আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার, কৃষকের নানা দাবি ও খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরির দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৬-'৬৭ সালের দিকে জমিদার-জোতদাররা কৃষক আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা সীতারাম মণ্ডলকে খুন করে এবং তাদের আক্রমণ মারাত্মক আকার নেয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সংগঠিতভাবে পার্টির নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিংহের উপর আক্রমণ হানার চেষ্টা করলে কমরেড নাকফর মণ্ডল সহ অন্য কমরেডরা মিলে তা রুখে দেন। তারপর আস্তে আস্তে দলের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং চাষি মজুরদের আন্দোলন তীব্রতর হয়। এই সময়ই কমরেড নাকফর মণ্ডল দলের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি দলের চিন্তাকে বহন করেছেন এবং গত পৌরসভা নির্বাচনে এই বয়সেও এলাকায় ভোটের প্রচার করেন।

কমরেড নাকফর মণ্ডল মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। দলের নতুন ছাত্র-যুব কর্মীদের কাছে পেলে পুরনো আন্দোলনের গৌরবময় উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা আবেগের সাথে তুলে ধরতেন।

তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মির্জা নাসিরউদ্দিন, কমরেড অনুরাধা মণ্ডল, বিশিষ্ট আইনজীবী ও পার্টির পুরনো সংগঠক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড উজ্জ্বল দাস ও রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড সুনীল হাজরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

**কমরেড নাকফর মণ্ডল লাল সেলাম**

# নিন্দার ভাষা নেই

*একের পাতার পর*

নিদান দিয়েছে এবং নাচ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠান করছে তাকে নিন্দা করার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র করেছিল। অবিভক্ত বাংলার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা রুখে দিয়েছিল। এ ছিল বাংলার অর্জিত গৌরব। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সহ দেশের শ্রদ্ধেয় মানুষেরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের সেই জঘন্য চক্রান্তকেই বাস্তবায়িত করতে ১৯২৩ সালে সাভারকার দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা উত্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে অপর এক সাম্প্রদায়িক শক্তি মুসলিম লিগ এই তত্ত্বকেই সমর্থন করেছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বইতে এ কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন। অত্যন্ত বেদনার বিষয়, 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'-এর নামে শোধনবাদী সিপিআই ১৯৪২ সালে বাস্তবে সাভারকার এবং আরএসএস-এর উত্থাপিত এই দ্বিজাতি তত্ত্বকেই মেনে নিয়ে কার্যত পাকিস্তান গড়ার অর্থাৎ দেশভাগের পরিকল্পনাকেই শক্তিশালী করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ সহ দেশের বরেণ্য মানুষেরা এবং আপামর জনসাধারণ যে বিষয়ে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, আজ বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তাই নিয়ে আনন্দ অনুষ্ঠানের নিদান দিচ্ছে।

মোদি সরকার দেশের মানুষের বাঁচার সুযোগ যত কেড়ে নিচ্ছে, পুঁজিপতিদের জন্য যত বেশি লুঠের ব্যবস্থা করছে, ততই সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা হিন্দুত্ববাদী ও সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা সামনে এনে তাদের অপশাসনকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। 'পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস' উদযাপন তেমনই একটি অ্যাজেন্ডা। আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান বাতিলের দাবিতে সর্বস্তরের মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন করছি।

# বিদেশে গিয়ে গণতন্ত্রের বড়াই
# দেশে তাকেই দু'পায়ে দলছেন প্রধানমন্ত্রী

আমেরিকা সফরে গিয়ে গলা ছেড়ে গণতন্ত্রের জয়গান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলেছেন, 'গণতন্ত্র বয়ে চলেছে ভারতের ধমনীতে। গণতন্ত্রেই বাঁচে ভারত।' আরও বলেছেন, 'মোদি সরকারও গণতন্ত্রেরই পূজারী।'

বাস্তবিকই, এমন রাতকে দিন নরেন্দ্র মোদিই করতে পারেন। কারণ, তিনি এমন একজন 'গণতান্ত্রিক' শাসক, যাঁর শাসনে বিরোধী দল থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বুদ্ধিজীবী থেকে সাংবাদিক—যারাই সরকারের অপছন্দের, তাদের সকলের ত্রাহি ত্রাহি রব। গণতন্ত্রের প্রতি এই শাসকের মান্যতা এমনই যে তিনি গত ন'বছরের শাসনকালে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে একবারের জন্যও কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেননি।

এবারের আমেরিকা সফরেও সাংবাদিকদের এড়াতেই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের চাপে বাধ্য হয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে। মুখোমুখি হতে হয়েছে অমোঘ কিছু প্রশ্নের, যার বিষয়বস্তু ভারতে মুসলিমদের উপর অত্যাচার, মানবাধিকার লংঘন এবং সমালোচক ও বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ। 'শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি'— এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করে উত্তর দিতে গিয়ে ১২ বার 'গণতন্ত্র' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন মোদি। বলেছেন, তাঁর সরকারের কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সকল ভারতীয়েরই সহজলভ্য। বলেছেন, মানবাধিকার লংঘন ও বৈষম্যের পথ ধরলে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে গণ্য হতে পারত না। দেখা যাক, নরেন্দ্র মোদির ভারতের শিরায় শিরায় কীভাবে বয়ে চলেছে গণতন্ত্রের রক্তস্রোত।

### সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ

নরেন্দ্র মোদির শাসনে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছে বোধহয় সংবাদমাধ্যমই। ফতোয়া দিয়ে টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স যেমন কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার, তেমনই সরাসরি প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুক সহ সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমকে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করে চলেছে। এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ অজস্র। টুইটারের পূর্বতন প্রধান জ্যাক ডরসি সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, ভারত হল এমন একটি দেশ যেখানে সরকারের সমালোচনামূলক পোস্টগুলি তুলে নেওয়া না হলে টুইটারের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাশি চালানো হবে বলে হুমকি দেন সরকারি কর্তাব্যক্তিরা।

কিছুদিন আগে ঘটা প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা বিবিসি-র হেনস্থার কথা অনেকেরই মনে আছে। নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সত্যনিষ্ঠ একটি তথ্যচিত্র বানানোর 'অপরাধে' প্রবল গণতান্ত্রিক বিজেপি সরকার বিবিসি দফতরে আয়কর বিভাগের হানাদারি চালায়, যে ঘটনার বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছিল গোটা বিশ্ব। এই সরকার এমনই গণতান্ত্রিক যে বিরোধী প্রচারে লাগাম পরাতে তথ্যপ্রযুক্তি আইনকে বদলে দেয়। খবর তো বটেই, এমনকি পছন্দসই না হলে সমাজমাধ্যম-সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতে চলা যে কোনও ধরনেরই লেখাকেই 'জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী' বলে দাগিয়ে প্রচার বন্ধ করে দেওয়ারও বন্দোবস্ত করেছে এই সরকার।

ভারতে গণতন্ত্রের এমনই রবরবা যে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে হয় কথায়, নয় কথায় সাংবাদিকদের উপর জুলুম চালানো, তাঁদের জেলবন্দি করা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে। সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের কথা সকলেরই মনে আছে। উত্তরপ্রদেশে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও সে রাজ্যের বিজেপি সরকারের পুলিশ কর্তৃক মৃত মেয়েটির দেহ গোপনে পুড়িয়ে দেওয়ার খবর করতে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ফল, দীর্ঘদিন জেল-যন্ত্রণা ভোগ। আরও কয়েকশো সাংবাদিক বিজেপি-জমানায় স্রেফ বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করার জন্য জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্তত সাত জনের বিরুদ্ধে এমন ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যেগুলি ব্যবহার করা হয় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিক ভারতে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এভাবেই রক্ষার ব্যবস্থা করেছে নরেন্দ্র মোদির গণতান্ত্রিক বিজেপি সরকার। সঙ্গত কারণেই এই সরকারের ন'বছরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক তালিকায় ভারতের স্থান ক্রমাগত নিচে নেমে এ দেশের ধমনীতে বইতে থাকা গণতন্ত্রের হাল বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।

### ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নিগ্রহের শিকার

ভারত একটি ঘোষিত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদি-নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যবাদের দাপটে অন্য ধর্মাবলম্বীদের টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই। প্রতিনিয়ত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। গোরক্ষার নামে দরিদ্র সংখ্যালঘু মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। একের পর এক এই ধরনের নৃশংস খুনের ঘটনায় সরকারের ভূমিকা স্রেফ নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের। পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা অহরহ সংখ্যালঘুবিদ্বেষী ঘৃণাভাষণ ছড়িয়ে চলেছেন। বিজেপি-শাসিত উত্তরাখণ্ডে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রকাশ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক ভাবে বয়কট করার ডাক দিয়েছেন। যে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় সাংবাদিকদের সামনে গণতন্ত্রের জয়ঢাক পিটিয়ে এলেন, নির্বাচনী সভাগুলিতে মুসলিমবিদ্বেষী ভাষণ দিতে তাঁর নিজেরই কোনও কুণ্ঠা নেই। ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বানিয়ে তুলতে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন সহ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডগুলিতেও হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে তিনি অত্যন্ত তৎপর। যে কোনও নির্বাচনের আগে এলাকায় এলাকায় দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে ভোটবাক্সে তার ফয়দা লোটা এখন বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী কৌশল, যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত থাকে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলের নেতাদের। গণতন্ত্রের জয়জয়কারই বটে!

### জম্মু-কাশ্মীর আইন

গণতন্ত্রের বড়াই করা নরেন্দ্র মোদি ২০১৯ সালে চূড়ান্ত স্বৈরাচারের পরিচয় দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে ঐতিহাসিক কারণে প্রাপ্য রাজ্যটির বিশেষ অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে সেটিকে দু-টুকরো করে কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছেন। চার বছর কেটে গেলেও কাশ্মীরের মানুষের নির্বাচিত বিধানসভা কবে হবে তা নিয়ে সরকার ক্রমাগত টালবাহানা করে চলেছে। হাজার হাজার নাগরিককে জেলবন্দি বা গৃহবন্দি করে রেখেছে বিজেপি সরকার। রেহাই পাননি সেখানকার মূলধারার রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাও।

### বিতর্কিত আইন ও রায়দান

আমেরিকায় গিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের ফানুস উড়িয়ে এলেন যে নরেন্দ্র মোদি, তাঁর সরকারই 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন' বা সিএএ নামে যে আইনটি চালু করেছে, সেটি খোলাখুলিভাবেই মুসলিম-বিরোধী। এই আইনে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ বিস্ময়কর ভাবে এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুসলিমদের ঠাঁই দেওয়া হয়নি।

নরেন্দ্র মোদির শাসনকালেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায়বিচারের তোয়াক্কা না করে বাবরি মসজিদের জমিতে রামমন্দির নির্মাণের রায় দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের চালু করা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন যা তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমন করতে তৈরি করেছিল, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার সেই আইনকে আরও কঠোর করে তুলেছে। চরম স্বৈরাচারীর মতো বিজেপি সরকার ২০১৬-২০১৯ এই সময়কালে সরকারের সমালোচকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে যে অভিযোগ দায়ের করেছে তা অতীতের তুলনায় ১৬০ শতাংশ বেশি। অথচ সরকারি রিপোর্টই বলছে, আদালতে এই অভিযোগের মাত্র ৩.৩ শতাংশ প্রমাণ করতে পেরেছে সরকার।

### বিরোধিতা হলেই প্রতি-আক্রমণ

ভারতের ধমনীতে গণতন্ত্রের এমন ধারা বইছে যে, ক্ষমতায় বসার পর থেকে সমস্ত গণতান্ত্রিক নৈতিকতা দু-পায়ে মাড়িয়ে পুলিশ-প্রশাসন সহ সরকারি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের নাস্তানাবুদ করে চলেছে বিজেপি সরকার। অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের গায়ে আঁচড়টুকুও পড়ছে না। দুর্নীতির অভিযোগে ফেঁসে যাওয়া বিরোধী নেতাদের অনেককেই দল বদলে বিজেপির আশ্রয় নিয়ে সরকারি তদন্তের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

### মানবাধিকার কর্মীদের উপর আক্রমণ

নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে সমাজকর্মী বা মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় অভিযোগ দায়ের করার ঘটনা আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে।

সাতের পাতায় দেখুন

## আমরা নরেন্দ্র মোদিকে চাই না
## বিক্ষোভ আমেরিকায়

নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফর সাক্ষী হয়ে থাকল প্রবাসী ভারতীয়দের তীব্র মোদি-বিরোধী বিক্ষোভের। সামিল হয়েছিলেন মার্কিন নাগরিকরাও। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উষ্ণ অভ্যর্থনা যে সে দেশের মানুষের 'মন কি বাত' নয়, তা প্রকাশ্যে এল। ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিজেপি সরকারের নগ্ন ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষ আমেরিকার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানালেন। ২১ জুন নিউইয়র্কে দেখা গেল মোদির বিরুদ্ধে ব্যানার ও পোস্টারে সুসজ্জিত প্রতিবাদ মিছিল। ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমজীবী মানুষের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে জ্বলজ্বল করছিল— 'মোদি নট ওয়েলকাম', 'সেভ ইন্ডিয়া ফ্রম হিন্দু সুপ্রিমেসি', 'রাইজেন হিটলার ইন দ্য ইস্ট', 'হাউডি ডেমোক্রেসি' ইত্যাদি। দেশ বিভাজনের কারিগরকে আমেরিকায় সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকেও তীব্র ধিক্কার জানান তাঁরা।

ভারতে একের পর এক মুসলিম-খ্রিস্টান-দলিত নিধন, দেশদ্রোহী দাগিয়ে দিয়ে নিরপরাধদের দিনের পর দিন জেলে পুরে রাখার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে আমেরিকার নানা জায়গায়। সেখানকার মানবাধিকার কর্মী সহ নানা অংশের মানুষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে জোরালো দাবি তুলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে প্রশ্নগুলি রাখার জন্য। এমনকি এর প্রতিবাদে কয়েক জন সেনেট সদস্য মার্কিন কংগ্রেসে মোদির বক্তব্য বয়কট করেছেন।

ভারতে বিজেপির গণতন্ত্রকে পদদলিত করার প্রতিবাদে ওয়াশিংটনেও কয়েকশো ইন্দো-মার্কিন নাগরিক বিক্ষোভ দেখান। এতে সংবাদমাধ্যম এবং মুক্তমনা মানুষদের উপর আক্রমণেরও তীব্র নিন্দা করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ ভারতের শীর্ষকর্তাদের বৈঠক যত আড়ম্বরপূর্ণই হোক না কেন, আর তাতে যত চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক না কেন, তা যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়, তা দু-দেশের শ্রমজীবী মানুষই জানেন। মার্কিন নাগরিকদের বিক্ষোভ সেই বার্তাই দিয়ে গেল।

## নৈতিকতার সংকট আজ চিকিৎসা পেশাতেও

# শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোয় সমাধানের খোঁজ

মেডিকেল এথিক্সের অবনমন, এই ক্ষেত্রে নৈতিকতার সংকট ভাবাচ্ছে এই পেশার সাথে যুক্ত মননশীল মানুষদের। এই কারণেই ২৩ জুন, ‘সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক সংকট, চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা ও শিবদাস ঘোষের আদর্শ’ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ‘শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি, মেডিকেল ইউনিট’।

বিষয়টি নিয়ে গভীরে ভাবনাচিন্তা করতে কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রের কনফারেন্স হলের এই সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ জি জি কর, প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি ভৌমিক, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ অশোক সাহা, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ টি কে মান্না, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রাক্তন সিএমওএইচ ডাঃ সুকান্ত শীল, বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ অনুপ মাইতি, নিউরোলজিস্ট ডাঃ ডি পি চক্রবর্তী, প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার অচ্যুত ঘোষ, বিশিষ্ট ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জেন ডাঃ নূপুর ব্যানার্জি, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ অশোক মাইতি, কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত কয়েকজন অধ্যাপক সহ আরও বহু স্বনামধন্য চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল ও নার্সিং ছাত্র-ছাত্রী এবং স্বাস্থ্যকর্মী।

বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট ক্যান্সার সার্জেন ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত বলেন, মেডিকেল প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাচ্ছি। আমরা এটাকে পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছি। ফলে মেডিকেল এথিক্সের অবনমন হচ্ছে। কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন কী ভাবে বর্তমানে সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক অবক্ষয় মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে গভীর সংকট ডেকে আনছে। এই সংকট থেকে চিকিৎসা পেশাও মুক্ত নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন এই সংকটেরও একটা কারণ আছে এবং এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। তাই সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নূতন ও উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সাংস্কৃতিক সংকটের নিরসন সম্ভব। এবং তা করতে গেলে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শই আমাদের সামনে একমাত্র হাতিয়ার।

তিনি আলোচনা করে দেখান, কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ কথাটার মানে বর্তমান যুগে মার্কসবাদ লেনিনবাদের সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী চিন্তাধারা। বৈজ্ঞানিক এই মতবাদের আবেদন এবং তার প্রয়োগ বিশ্বজনীন— শুধুমাত্র এ দেশের মাটিতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। তাই বর্তমান সমাজে চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও উন্নত সংস্কৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে মর্যাদাময় জীবন যাপন করতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজন। তিনি উপস্থিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ অনুশীলন এবং তা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান।

# লরি থেকে পাথর নামাতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি এআইইউটিইউসি-র

১৯ জুন গভীর রাতে কলকাতার বেলেঘাটায় হেমচন্দ্র নস্কর রোডে লরি থেকে ভারি মার্বেল পাথর নামানোর সময় সেই পাথর চাপা পড়ে স্বপন মারজিৎ (৩৫) নামে এক শ্রমিক মারা যান। আহত হন অমর মণ্ডল নামের আর এক শ্রমিক। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। উপযুক্ত সুরক্ষা ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য করার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ দেশে সুরক্ষাহীন ভাবে কাজ করতে গিয়ে বহু শ্রমিকের জীবন এ ভাবেই চলে যায়। তবুও মালিক ও কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদের ঝুঁকিবহুল কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয় না। আমরা দাবি করছি, মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিককে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সমস্ত ধরনের কাজে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

# শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে ছাত্রদের সভা এবং বুকস্টল

২৪ জুন এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির আহ্বানে ভারতবর্ষের আপসহীন ধারার অন্যতম বিপ্লবী ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় মূল আলোচনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও বর্তমানে এসইউসিআই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও এসইউসিআই (সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী, সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড পিন্টু দাস। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অঞ্চলের শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

৫ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী, মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এআইডিএসওর উদ্যোগে রাজ্যের নানা জায়গায় বুক স্টল হয়। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে ২৩ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এআইডিএসও-র বুকস্টল।

*দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে বুকস্টল। ২৪ জুন*

# ই-রিক্সা চালক ইউনিয়নের

## পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

১১ জুন মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে সারা বাংলা ই-রিক্সা টোটো চালক ইউনিয়নের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সব টোটো চালু রাখা, প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, প্রতিটি গাড়ির সরকারি রেজিস্ট্রেশন ও দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু সহ ছ’দফা দাবিতে সম্মেলনে বিভিন্ন ব্লক থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম এবং শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য পূর্ণ বেরা বলেন, যখন সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় বন্ধ, বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলছে তখন নিরুপায় হয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক টোটো চালিয়ে কোনও রকমে সৎ ভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ব্যাটারি চালিত শব্দবিহীন পরিবেশবান্ধব এবং কম খরচে স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের নির্ভরযোগ্য যান এটি। টাটা মাহিন্দ্রা সুজুকি মারুতি ইত্যাদি বড় বড় গাড়ি উৎপাদন কোম্পানিগুলির গাড়ি বিক্রির বাজার বাড়ানোর স্বার্থে একে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না সরকার। টোটো চালকদের পরিবহন শ্রমিকের মর্যাদা দিয়ে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার দাবিতে ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার করবে।

সম্মেলনে সুরজিৎ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক, অশোক দাসকে সহ-সম্পাদক, দীনেশ মেইকাপকে সভাপতি ও দিলীপ দাসকে সহ-সভাপতি করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

## মহান নেতার শিক্ষা

### কেতাবি জ্ঞান দিয়ে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না

### ভি আই লেনিন

“কমিউনিজম সম্পর্কে নিছক কেতাবি জ্ঞান আয়ত্ত করতে যাওয়াটা হবে মস্ত বড় ভুল। কমিউনিজম সম্বন্ধে এতদিন ধরে যা কিছু বলা হত, আমাদের বক্তৃতা

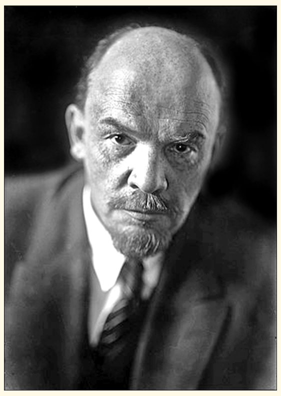

আর প্রবন্ধগুলোতে তার নিছক পুনরাবৃত্তি করলে হবে না। কারণ এখন আমরা যা বলছি ও লিখছি তা সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে যুক্ত। কাজ না করে, সংগ্রাম না চালিয়ে কমিউনিস্ট বইপত্র আর পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া কেতাবি জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। কারণ, এর ফলে, তত্ত্ব আর ক্রিয়ার মধ্যে যে ব্যবধান বহুকাল ধরে চলে আসছে, পুরোনো বুর্জোয়া সমাজেও যে ব্যবধান একটা মারাত্মক ক্ষতিকর ফাটলের মতো ছিল, সেটা রয়েই যাবে। ...

পুরনো স্কুলগুলিতে শুধুমাত্র পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা দেওয়া হত। সেখানে ছাত্ররা একগাদা অকার্যকরী, অনাবশ্যক, নিষ্ফলা জ্ঞান মাথায় ঢোকাতে বাধ্য হত, যা মস্তিষ্কের চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট করত এবং তরুণরা একটা বাঁধা ছকে তালিম পাওয়া আমলায় পরিণত হত। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, মানবজাতির আহরিত এবং সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত না করেই কমিউনিস্ট হওয়া যায়। এরকম সিদ্ধান্ত টানা মানে বিরাট ভুলের খপ্পরে পড়ে যাওয়া। যে সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় থেকে কমিউনিজমের উদ্ভব, সেগুলো আয়ত্ত না করে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট স্লোগানগুলো শিখে নিলে এবং কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো জেনে নিলেই কমিউনিস্ট হওয়া যায়, এমনটা ভাবা ভুল। মানবসভ্যতার যাবতীয় জ্ঞানের সমষ্টি থেকে কী ভাবে কমিউনিজমের উদ্ভব ঘটল, তা দেখিয়ে দিতে মার্কসবাদই হচ্ছে একটা দৃষ্টান্ত।”

— যুব লিগের কর্তব্য

## কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

*একের পাতার পর*

কারণ, তারা মার্কসবাদের নামে যা শেখায়, বিপ্লবের নামে যা শেখায়, তা আসলে ভুল শেখায়। রাজনৈতিক বুকনির বাইরে ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে যারা করে বেড়ায়, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যেমন নেতার, তেমন কর্মীর যা ইচ্ছে যাদের ব্যাখ্যা থাকে, তেমন করে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির চলতে পারে, মার্কসবাদী পার্টির এভাবে চলার রীতিও না এবং চলতে পারেও না। এবং যে পার্টি মার্কসবাদের নামে এমনভাবে আচরণ করে, বুঝতে হবে, সে পার্টি আসলে মার্কসবাদের তকমা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি। তারা বিপ্লবের নামে যে সংগ্রাম করে তা বিপ্লব নয় এবং বিপ্লবের নামে যা বলে তা শুধু বুকনি মাত্র, বুলিসর্বস্বতা মাত্র, তার মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রাণ নেই, বিপ্লব নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে মার্কসবাদ শিখতে গেলে তা মার্কসবাদের নামে আসলে অন্য জিনিস শেখা হয়।”

*কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল*

**শিবদাস ঘোষ**

## মণিপুর ঃ ৩০ জুন প্রতিবাদ দিবস

*একের পাতার পর*

করতে হবে, যেটা তারা চাইলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করতে পারে।

মণিপুরের শান্তিপ্রিয় সকল অংশের জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা নিজেদের ঐক্যকে আরও সংহত করুন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী-জাতিবাদী চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করুন এবং এর মধ্য দিয়ে জনগণের জ্বলন্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার রাস্তা উন্মুক্ত করুন। এই পথেই সকল অংশের জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

**ভারতবর্ষের জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, মণিপুরের এই ভয়াবহ রক্তপাতের পিছনে সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে ৩০ জুন দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করুন।**

## শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদ স্মরণে সভা

১৯৯৮ সালের ২৯ মে সিপিআইএম আশ্রিত ঘাতকবাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে এস ইউ সি আই (সি) দলের পূর্বতন নদীয়া জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য ও এলাকার গরিব মানুষের আন্দোলনের নেতা কমরেড আব্দুল ওদুদকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। শহিদ কমরেড আব্দুল ওদুদের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই বছর ২৯ মে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় নদিয়ার বারুইপাড়া বাজারে।

স্মরণসভায় কমরেড আব্দুল ওদুদের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড ইসমত আরা খাতুন, দলের নদিয়া উত্তর জেলা সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত কমরেড ওদুদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শহিদ আবদুল ওদুদ স্মৃতিভবন রক্ষা কমিটির সভাপতি কমরেড এম রহমতুল্লাহ সেখ।

## ডাক্তারদেরও ভোটের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে

### প্রতিবাদ সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চরম রক্তশূন্যতার লক্ষণ প্রকট। বহু চিকিৎসক পদ ফাঁকা পড়ে আছে। পরিষেবা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এর মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ডাক্তারদেরও ভোটে ডিউটির জন্য নাম দিয়েছে। সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম প্রতিবাদ জানানোয় কমিশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ২০ জুন বলেন, ডাক্তারদের ভোটের কাজে নেওয়া হবে না।

এরপরেও বহু জেলায় ডাক্তারদের নাম ভোটের ডিউটির তালিকায় থেকে গেছে। সার্ভিস ডক্টর ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস অবিলম্বে ওই সমস্ত তালিকা থেকে ডাক্তারদের নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে ২৩ জুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন।

*১১ জুন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গ্রামীণ চিকিৎসকদের শিক্ষণ কোর্সের ষষ্ঠ বর্ষের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন পিএমপিএআই-এর মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। এছাড়া সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম সহ অন্যান্য চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন*

## বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের শহিদ স্মরণ

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ‘বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১২ জুন বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহিদ মুজিবর সেখের স্মরণ দিবস পালন করা হয় রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলায়।

বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার মোড়ে বিড়ি শ্রমিকরা স্মরণ সভা করেন। শহিদ বেদিতে মাল্যদান, শপথবাক্য পাঠ, শহিদ স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহিলা বিড়ি শ্রমিকরা। বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি ও এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

তিনি বলেন, ২০০২ সালে ১২ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার বৈষ্ণবডাঙা গ্রামে বিড়ি শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা আত্মসাৎ করেছিল মালিকের অধীনে থাকা ঠিকাদার নূরে আলম। পিএফ-এর টাকা আদায়ের দাবিতে বিড়ি শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সিপিএম সরকারের পুলিশ এই আন্দোলনে গুলি চালায়। বিড়ি শ্রমিক মুজিবর সেখ শহিদ হন।

মালিকরা আজও বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেয় না। সবাইকে সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। মালিক ও ঠিকাদাররা পিএফ, বোনাস দেয় না। বিড়ি শিল্প থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেস আদায় বন্ধ করে জিএসটি চালু করেছে। বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন চালু ছিল, তা বন্ধ হতে চলেছে। বর্তমানে বিড়ি শ্রমিকদের

আর্থিক সহায়তা প্রায় দেওয়াই হয় না। এই সমস্ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১১ দফা দাবিতে জেলায় জেলায় ঐক্যবদ্ধলাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

# এমএসপি ঘোষণাই সার
# চাষির সুরাহা নেই

৭ জুন কেন্দ্রীয় সরকার ১৭টি খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করেছে। কৃষক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি এমএসপি। এই দাবি পূরণে মোদি সরকার বারবার টালবাহানা করে চলেছে। 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছে। কৃষক সমাজের মধ্যে প্রবল বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভের আগুন যে ধিকিধিকি করে জ্বলছে, রাজ্যে রাজ্যে কৃষকদের নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিজেপি তা টের পেয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন কয়েক মাস পরেই। ফলে স্রেফ ভোটের কথা মাথায় রেখেই বিজেপি সরকার কৃষক বিক্ষোভ সাময়িকভাবে প্রশমিত করতে এমএসপি কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘোষণার কয়েক দিন আগে থেকে কুরুক্ষেত্রের পিপলিতে কৃষকরা মহাপঞ্চায়েত করে সূর্যমুখী তেলের এমএসপি কুইন্টাল প্রতি ৬৪০০ টাকায় করার দাবি তুলেছে। এই দাবিতে দিল্লিগামী ৪৪ নং জাতীয় সড়ক তারা অবরোধ করে। হরিয়ানার বিজেপি সরকার এই আন্দোলনে লাঠিচার্জ করে এবং কয়েক জন কৃষক নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

এমএসপি কী? এটি হল কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা, কখনও রাজ্য কিছুটা বোনাস মূল্য এর সঙ্গে যুক্ত করে, যাতে কৃষকদের ঘিরে একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয়। কেন এই নিরাপত্তা বলয় জরুরি? কারা কৃষকের আর্থিক নিরাপত্তা বিপন্ন করে? কৃষকের নিরাপত্তার সামনে প্রধান বাধা খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া বৃহৎ ব্যবসায়ীরা, যারা কৃষিপণ্যের ক্রেতা। এদের কাছে ফসল বিক্রি করা ছাড়া কৃষকের অন্য কোনও পথ নেই। এরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ মুনাফা করতে দাম যতদূর সর্বনিম্ন করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই দরকষাকষিতে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় কৃষক। কারণ ফসল বিক্রির জন্য তার বিকল্প কোনও জায়গা নেই। ব্যবসায়ীদের দয়ার উপর তাদের বাঁচতে হয়। ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজারে যখন কৃষিপণ্যের দাম উৎপাদন ব্যয়ের সমান বা তার নিচে নেমে যায়, কৃষক ধ্বংসের কবলে পড়ে। তার বেঁচে থাকাটাই দুঃসহ হয়ে ওঠে। কৃষক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এইভাবে কৃষকের ভূমিহীন হওয়ার প্রক্রিয়া প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বত্র দেখা যায়।

এই অবস্থায় কৃষকের বাঁচার পথ কী? এই সঙ্কটের সামনে আশু প্রয়োজন হল কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের বিকল্প হিসাবে সরকারিভাবে কেনার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এ কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রয়েছে প্রচণ্ড গাফিলতি। সরকার যে এমএসপি ঘোষণা করেছে তাতে বলা হয়েছে, ১৭টি কৃষিপণ্যে ৫-১০.৫ শতাংশ এমএসপি বাড়বে। গড় বৃদ্ধি ৭ শতাংশ। সিটি রিসার্চ দেখিয়েছে, এই সময়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ। তাহলে গড়ে সাত শতাংশ বৃদ্ধি কৃষকদের সঙ্গে মস্ত বড় তামাশা ছাড়া আর কী?

তামাশার দ্বিতীয় পর্বটি চমৎকার। এমএসপি ঘোষণা করলেই সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সাথে সেই দামে কিনতে নামে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা করে চাষিদের ঠকিয়ে বিপুল মুনাফা যাতে করতে পারে এবং প্রতিবার ইলেকশনে যাতে এই দলকেই ক্ষমতায় বসায়, সেই লক্ষ্যে সরকার কৃষিপণ্য কেনায় 'ধীরে চলো' নীতি নেয় এবং কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহও দেখায় না। আবার কৃষকদের আন্দোলনের চাপে সামান্য যতটুকু বা কেনে সেটা সব রাজ্যে নয়, মুষ্টিমেয় কিছু রাজ্যেই তা সীমাবদ্ধ। ক্রিসিল রিসার্চ রিপোর্ট দেখিয়েছে, ধান, তুলো এবং কিছু ক্ষেত্রে ডাল এমএসপিতে কেনা হয়। ঘোষিত পণ্যগুলির সব কেনা হয় না। ধান, তুলো ও ডালের কতটুকু কেনা হয়? রিপোর্ট বলছে, উৎপাদিত ধানের মাত্র ৪৫ শতাংশ কেনা হয়, তুলো কেনা হয় ২৫ শতাংশ, আর ডাল কেনা হয় ১-৩ শতাংশ। অর্থাৎ ধানের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ, তুলো ৭৫ শতাংশ এবং ডালের ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ খোলা বাজারের হাঙরের সামনে ফেলে রাখা হয়েছে। বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থে এইভাবে সরকার কৃষকদের স্বার্থ বলি দিচ্ছে। তার ঘোষিত এমএসপি কার্যকর করছে না।

ক্রিসিল রিসার্চ রিপোর্ট আরও দেখিয়েছে, সামান্য যতটুকু সরকার কেনে সেখানেও রয়েছে প্রাদেশিক বৈষম্য। ধানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সরকারি ক্রয় মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশে, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যে সীমাবদ্ধ। তুলো কেনা হয় তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে। আর ডাল কেনা হয় মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে। বাকি সব রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যদি কিছু কেনাও হয় তা যে নামে মাত্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই এমএসপি ঘোষণা বাস্তবে চাষি শোষণের সামনে কতটুকু প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে? কৃষক স্বার্থকে গুরুত্ব দিলে সরকারের উচিত ছিল উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সাপেক্ষে যথাযথভাবে এমএসপি ঘোষণা করা এবং সব রাজ্যে তা কার্যকর করা। বাজারে আনা পণ্যের সবটা সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা করা। সরকার তা করেনি। এটা শুধু কৃষকের স্বার্থে জরুরি তা নয়, ক্রেতাদের স্বার্থেও জরুরি। তা না হলে কৃষিপণ্যের দাম ব্যবসায়ীরা আরও বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। খাদ্যব্যবসায়ীদের স্বার্থে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার যেমন এই সমস্যার সমাধান করেনি তেমনই বর্তমান বিজেপি সরকারও। রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম এবং বর্তমান তৃণমূল সরকার ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই পালন করছে না।

কিন্তু কেন কৃষকদের এমন ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দশকের পর দশক চোখের সামনে দেখেও এই দলগুলির সরকার কেউই তা নিরসনের জন্য কোনও চেষ্টা করে না। আসলে শ্রেণিগত ভাবে এই দলগুলির কোনওটিই শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষাকারী দল নয়। দল মানেই শ্রেণি দল। এই দলগুলি সকলেই শিল্পক্ষেত্রে যেমন শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা

*আটের পাতায় দেখুন*

# বিশ্ববাজারে আরও সস্তা হল তেল
# দেশে কমবে না কেন

কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী সম্প্রতি বলেছেন, এখনই না হলেও দু-তিন মাসের মধ্যে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমবে। বলেছেন, ক্রেতারা যাতে সমস্যায় না পড়েন, তা দেখা হবে। অর্থাৎ মন্ত্রীর বোধ অনুযায়ী তেলের বিপুল দামে ক্রেতারা এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যায় পড়েনি। অবশ্য জনসাধারণ সম্পর্কে এমন ধারণা না থাকলে তাঁকে আর মন্ত্রী করা হবে কেন! যদিও তিনি দাম কমানোর ক্ষেত্রে অনেক 'যদি এবং কিন্তু' রেখেছেন। বলেছেন, যদি অশোধিত তেলের দাম স্থিতিশীল থাকে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির আয় যদি আগামী তিন মাসে ভাল হয়, তা হলে তারা তেলের দাম কমানোর কথা ভাবতে পারে। মন্ত্রীকে অবশ্য জনসাধারণের লাভ-লোকসান নিয়ে হিসেব কষতে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে তেলের দাম নাকি বাড়ানো হয়নি। ফলে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সরকার তেল কোম্পানিগুলির লাভের কথা ভাবছে আর সেই লাভের কড়ি জোগাতে জনসাধারণের যে পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তাঁর। দাম কমানোর আসল 'গল্প'টা অবশ্য আলাদা। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে সরকার ছিটেফোঁটা যাই কমানোর কথা বলুক, ওই সময়টা বেছে নিয়েছে জনদরদি সাজতে।

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম কি আজ কমল? গত কয়েক মাস ধরেই তা কমছে। এখন তা ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার থেকে কমে ৭০ ডলারের নিচে চলে গেছে। কিন্তু সারা বিশ্বে তেলের দাম কমলেও ভারত সরকার তা কমতে দেয়নি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দিয়েছে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলির কাছে। কোম্পানিগুলি বিপুল পরিমাণ লাভবান হয়েছে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমেরিকা রাশিয়ার তেলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ফলে রাশিয়ার তেলের দাম হু হু করে নামতে শুরু করে। এই অবস্থায় এশিয়ার দেশগুলিতে তেল বিক্রির চেষ্টা করেছে রাশিয়া। সেই সুযোগে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি অত্যন্ত কম দামে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে তা পরিশোধন করে পাওয়া পেট্রল, ডিজেল যেমন ভারতের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করেছে, তেমনই ইউরোপ সহ বিশ্বের দেশে দেশে তা বিক্রি করেছে আন্তর্জাতিক দামেই। তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়া থেকে ৪০ ডলারের থেকে কম দামে তেল কিনলেও জনসাধারণকে চড়া দামে পেট্রল-ডিজেল কিনতে হচ্ছে। গোটা বিশ্বে রান্নার গ্যাসের দামের নিরিখে ভারত সর্বোচ্চ এবং পেট্রলের দামের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। অথচ সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

ইউক্রেন যুদ্ধের আগে রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেলের পরিমাণ অতি সামান্য হলেও ২০২৩ অর্থবর্ষে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে। মার্চে ভারত রাশিয়া থেকে ৫১.৫১ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে। বেসরকারি তেল কোম্পানি মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ২০২৩-এ। কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৭.৩ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে।

তা হলে দেশের বাজারে তেলের দাম এতখানি চড়া কেন? এর কারণ একদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তেল কোম্পানিগুলির জন্য সীমাহীন লুঠের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, অন্য দিকে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকার, সাথে রাজ্য সরকারগুলিও তেলের উপর চাপানো কর ও সেস কমাচ্ছে না। রিলায়েন্স কোম্পানিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সুযোগ দিয়েছে রাশিয়ার সস্তা তেল বেশি করে আমদানি করার। রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিকে এই তেল সরকার নিতে দেয়নি। ফলে দামও কমছে না। কোম্পানিগুলির বিপুল লাভের কড়ি জোগাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বেসরকারি কোম্পানিগুলি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কী বেপরোয়া লুঠ চালাচ্ছে দেখা যাক। সংসদে কেন্দ্রীয় তেল প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তেলের শুল্ক থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কেন্দ্রের আয় হয়েছিল ৪.৯২ লক্ষ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৪.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ তে এই আয় ছিল যথাক্রমে ৩.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা এবং ৩.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ লকডাউনকে কেন্দ্র করে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, যখন মানুষ ভেবে পাচ্ছে না সংসার চালাবে কী করে, তখন ২০১৯-২০-র থেকে পরের বছর এক লাফে অতিরিক্ত ১ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের ঘাড় ভেঙে তুলেছে। পরের বছর তা আরও বেড়েছে।

সরকার তেল কোম্পানিগুলির ক্ষতির কথা বলছে। দেখা যাক তেল কোম্পানিগুলির লাভ হচ্ছে, না ক্ষতি। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়া ২০২২-এ লাভ করেছিল ৩৮৮৭ কোটি টাকা, ২০২৩-এ লাভ করেছে ৬৮১০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। ইন্ডিয়ান অয়েল ২০২৩-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে লাভ করেছে ৭৭৩.২৩ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ২০২২-২৩-এ ৮৭.৩ শতাংশ রাশিয়ান তেল আমদানি করে লাভ করেছে ১৯ হাজার ২৯৯ কোটি টাকা। লাভ করেছে অন্য তেল কোম্পানিগুলিও। আসলে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কোম্পানিগুলির লোকসানের গল্প শুনিয়ে দেশের মানুষকে যে বোকা বানাতে চাইছেন, তা এই বিপুল লাভের খতিয়ান থেকে পরিষ্কার। মন্ত্রী মানে যে সরকারের ভেতরে পুঁজিপতিদের এজেন্ট, তা স্পষ্ট নয় কি?

তেল কোম্পানিগুলি বেপরোয়া লুঠ চালাতে পারছে কেন? মন্ত্রীদের সাথে তেল কোম্পানিগুলির দহরম-মহরম এর অন্যতম কারণ।

*সাতের পাতায় দেখুন*

## বিজেপির গুজরাট মডেল

# পাঁচ বছরে ৪০ হাজারের বেশি মহিলা নিখোঁজ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা হামেশাই 'গুজরাট মডেল'-এর কথা বলেন, সেখানকার 'বিকাশের' কথা, জনসাধারণের 'উন্নতির' কথা বলেন। গুজরাটে বিজেপি ক্ষমতায় আছে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে, সেই ১৯৯৮ সাল থেকে। এর ওপর ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সে রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার চলছে। কিন্তু সেই গুজরাটের ভিতরের এমন সব চিত্র মাঝেমাঝে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা দেখে আঁতকে উঠতে হয়।

সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্যে এরকম একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এনসিআরবি জানিয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০২০, এই পাঁচ বছরে গুজরাটে ৪১ হাজার ৬২১ জন মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন।

কেবল গুজরাটেই নয়, বিজেপি শাসিত সকল রাজ্যে, তথা গোটা দেশেই মহিলাদের সুরক্ষা আজ বিপন্ন। উত্তরপ্রদেশ থেকে কর্ণাটক, দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই মেয়েদের উপর অপরাধের ঘটনা বাড়ছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার আগে যে বিজেপি মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর স্লোগান তুলেছিল, তাদের সাংসদ এবং ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগিররা যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় ধরে ধর্নায় বসেছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁদের বিষয়ে কিছু বলেনি শুধু তাই নয়, পুলিশ দিয়ে বর্বরের মতো টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করেছে।

এর আগে উত্তরপ্রদেশে, বা জম্মু-কাশ্মীরে যখন তরুণী ও শিশুদের গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল, তখন বিজেপি সরকার দোষীদের বাঁচাতে রীতিমত তৎপর ছিল। এমনকি দোষীদের সমর্থনে বিজেপির নেতা-কর্মীরা মিছিল পর্যন্ত করেছিল। উত্তরপ্রদেশেরই উন্নাওতে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার একটি তরুণীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত হওয়ার পর, মেয়েটির বাবাকেও হত্যা করে। পুলিশ সে ক্ষেত্রেও প্রথমে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, পরে তীব্র প্রতিবাদের চাপে তারা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। কয়েক বছর আগে কর্ণাটকে এবং সদ্য ত্রিপুরায় বিজেপি বিধায়কেরা বিধানসভার অভ্যন্তরে নীল-ছবি দেখছিল। এরা তাহলে অন্য সময় কেমন জীবনযাপন করে? নারী নির্যাতনের মুখ্য কারণগুলি যথা মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রসার, সিনেমা ও বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহের অবাধ প্রদর্শন, ইন্টারনেটে যৌনতার খোলাখুলি প্রদর্শন বন্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। ফলে মেয়েদের প্রতি সম্মানবোধ আসবে কেমন করে? তাদের মানুষ হিসেবে নয়, উপভোগের বস্তু হিসেবে দেখা হয়। এভাবেই যুব-সমাজকে অমানুষে পরিণত করা হচ্ছে।

গুজরাটের কথায় ফিরে আসা যাক। কোথায় গেলেন ওই নিখোঁজ হওয়া বিপুল সংখ্যক মহিলা? প্রাক্তন আইপিএস অফিসার এবং গুজরাট রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সুধীর কুমার বলছেন, 'কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে বালিকা এবং মহিলাদের গুজরাটের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং জোর করে দেহব্যবসায় নামানো হচ্ছে।' তাঁর মতে খুনের মতোই গুরুত্ব দিয়ে এই সব ঘটনার তদন্ত করা উচিত। রাজ্যের প্রাক্তন এডিজি ডঃ রাজন প্রিয়দর্শীও মনে করেন দেহব্যবসায় নামানোর জন্যই ওই মহিলাদের একটা বড় অংশকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার কার্যকালে দেখেছি নিখোঁজ মহিলাদের অধিকাংশকেই দেহব্যবসায়ে নামানোর জন্য চক্রগুলো অন্য রাজ্যে নিয়ে যায় এবং তাদের বিক্রি করে দেয়।' খেড়া জেলার এই প্রাক্তন এসপি বলেন, 'একবার উত্তরপ্রদেশ থেকে কাজ করতে আসা একটি লোক এক মহিলাকে অপহরণ করে এবং তাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে খেতমজুর হিসেবে বিক্রি করে দেয়। আমরা সেই মহিলাকে উদ্ধার করি। তবে এমন সৌভাগ্য খুব কম জনের ক্ষেত্রেই ঘটে'। গুজরাটের মহিলাদের বিষয়ে এই সত্য প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে সামাজিক মাধ্যমে ঝড় ওঠে। এটাই যে প্রকৃত 'গুজরাট মডেল' সেই কথা অনেকে বলছেন। বাধ্য হয়ে আসরে নামতে হয় গুজরাট পুলিশকে। একদিনের মধ্যে তারা জানায় নিখোঁজ মহিলাদের মধ্যে ৯৪.৯ শতাংশকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মাত্র ২১২৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রথমত, যে গুজরাট পুলিশ রাজ্যে ভয়ঙ্কর গণহত্যার সময় নিষ্ক্রিয় ছিল, যারা ওই গণহত্যার সাক্ষী 'খুঁজে না পাওয়ায়' বহু নৃশংস অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেছে, যে রাজ্যের পুলিশ সঞ্জীব ভাট সহ প্রতিবাদী অফিসারদের জেলে পোরার জন্য মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে, যারা সোহরাবুদ্দিন, ইসরাত জাহান সহ অনেক নির্দোষকে মিথ্যা এনকাউন্টারে হত্যা করেছে, তাদের দেওয়া তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য? দ্বিতীয়ত, গুজরাট পুলিশের তথ্যই যদি সঠিক হয়, তা হলেও তো রাজ্যের ২১২৪ জন মহিলা নিখোঁজ রয়েছেন! এই ২১২৪ জন কি একটা নিছক সংখ্যা? এঁদের অনেকেরই তো পরিবার আছে, বাবা-মা-স্বামী-সন্তান আছে! এঁদের কি মর্যাদা নিয়ে বাঁচবার অধিকার নেই? কার দোষে নিষিদ্ধপল্লিকে এঁদের ঠিকানা বানাতে হচ্ছে? কোনও সভ্য দেশের গণতান্ত্রিক সরকার কি এই ভাবে এই মহিলাদের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে? দেশের মানুষ কিছুতেই এই পরিস্থিতি মানতে পারে না।

# বিদেশে গণতন্ত্রের বড়াই

*তিনের পাতার পর*

এইসব সমাজকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সমাজসেবী এমনকি কবিরাও। বিজেপি সরকারের অন্যায় কার্যকলাপের বিরোধিতা করলেই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে এই সমাজকর্মীদের বিনা বিচারে জেলবন্দি করে রাখা হচ্ছে। অতি বৃদ্ধ স্ট্যান স্বামীর জন্য এই সরকারের জেলে ন্যূনতম মানবাধিকারটুকুও জোটেনি। এমনকি সমাজমাধ্যমে সরকারবিরোধী কথা বললেও তার মাশুল গুনতে হচ্ছে মানুষকে।

**গোপন নজরদারি**

আমেরিকার সফরে গিয়ে গণতন্ত্রের ঢাক পিটিয়ে এলেন যিনি, মানুষ ভুলে যায়নি সেই নরেন্দ্র মোদি-সরকারের বিরুদ্ধেই গোপন নজরদারির যন্ত্র পেগাসাস ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বেসরকারি সংস্থার করা তদন্তে উঠে এসেছে, ইজরায়েল থেকে কেনা এই স্পাইওয়্যারটি ১৭৪ জন ব্যক্তির উপর নজরদারি চালাতে ব্যবহার করেছে মোদি সরকার। এঁদের মধ্যে বিচারপতি, মন্ত্রী, সাংবাদিক, বিরোধী দলের নেতা, বিজ্ঞানী— কে নেই! এ যদি একটি গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণ হয়, তাহলে স্বৈরাচারী সরকার আর কাকে বলে!

ফলে, বিশ্বের দরবারে বসে দেশ ও তাঁর সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে নরেন্দ্র মোদি যে কথাগুলি বলে এলেন, তা সত্যের ধারকাছ দিয়েও যায় না। বাস্তবে এই সত্য বিশ্বের কাছে আজ আর গোপনও নেই। তাই নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরে প্রবাসী ভারতীয়রা যেমন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তেমনই বেশ কয়েকজন মার্কিন সিনেটরও তাঁর ভাষণ বয়কট করেছেন। গুজরাট গণহত্যার দায় কাঁধে চেপে থাকায় ২০১৪ সাল পর্যন্ত খোদ আমেরিকাতেই প্রবেশ নিষেধ ছিল স্বয়ং নরেন্দ্র মোদির।

এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিন মোদির ভাষণের সম্প্রচার যাঁরা দেখেছেন, কলঙ্কের সেই অধ্যায়ের কথা কি তাঁরা ভুলে গেছেন? তা সত্ত্বেও সেসব ভাবনার তোয়াক্কা না করে গণতন্ত্র নিয়ে এ হেন নির্জলা মিথ্যাচারে বিশ্ববাসীর কাছে দেশের মাথা আসলে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এলেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য ওয়্যার, ২৩ জুন, '২৩ ও অন্যান্য সংবাদপত্র)

# ৫ই আগস্ট ব্রিগেড চলো

দিন বদলের স্বপ্নকথা
সারি সারি লাল পতাকা
আঁধার বেয়ে নতুন ভোরের আলো।
প্রতি রাতে একটু করে
উঠছে ফুটে শহর জুড়ে
৫ই আগস্ট চলো ব্রিগেড চলো;
শোষণ পীড়ন দীর্ণ বুকে
জাগছে আশা দিকে দিকে
খুঁজছে মানুষ নতুন পথের দিশা।
মিথ্যে কথার উন্নয়ন
মন কি বাতের বিজ্ঞাপন
বুঝছে মানুষ—কাটছে অমানিশা;
গ্রাম শহরে বন্দরে
প্রতিবাদের অন্তরে
উঠছে জেগে অনন্য এক নাম
সর্বহারার মহান নেতা শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম।

মিথ্যা ভোটের প্রহসনে
পুতুল নাচের সুতোর টানে
নাচবে না আর জাগছে সারা দেশ;
ধর্ম মোহের অন্ধকারে
মেকি বামের মিথ্যাচারে
ভুলবে না আর জাগছে সারা দেশ।

শোষণ জুলুম বাড়ছে যত
ক্ষোভের আগুন জ্বলছে তত
সেই আগুনেই জ্বালো মশাল জ্বালো;
রাত জাগা ঐ গানের সুরে
হচ্ছে লেখা দেওয়াল জুড়ে
৫ই আগস্ট চলো ব্রিগেড চলো।

—কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

# তেলের দাম কমবে না কেন

*ছয়ের পাতার পর*

মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে টু-জি কেলেঙ্কারির তদন্তে জানা গিয়েছিল, তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা ছিলেন টাটাদের মনোনীত। বিজেপি শাসনে পূর্বতন তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ছিলেন আম্বানিদের মনোনীত। বর্তমান তেলমন্ত্রী হরদীপ পুরী 'কে কী করে দেখে নেব' গোছের ভাব করে যেভাবে বলছেন, দুনিয়ার যে কোনও জায়গা থেকে কম দামে ভারত তেল কিনবে— তাতে তিনি যে কোম্পানিগুলিরই ঘরের লোক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছুদিন আগে সরকারই জানিয়েছিল তেল কোম্পানিগুলির সাথে বৈঠক করেই সরকার তেল-নীতি ঠিক করেছে। এই তেলমন্ত্রীর উমেদারিতেই অর্থমন্ত্রক গ্যাস উৎপাদনে 'লোকসান হচ্ছে' এমন হাস্যকর দাবি মেনে তেল কোম্পানিগুলিকে ২২,০০০ কোটি টাকা পুষিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ মুখে যা-ই বলা হোক, বাস্তবে এই সরকার শিল্পপতিদের দ্বারা, শিল্পপতিদের জন্য, শিল্পপতিদেরই সরকার। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বামনামধারী বা দক্ষিণপন্থী দল যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে তারা সাধারণ মানুষের 'দুঃখে' যত চোখের জল ফেলুক-ই না কেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সাথে সেই রাজ্য সরকারগুলিও তেলের উপর বসানো ট্যাক্স থেকে বিপুল আয় করে। ফলে তারা কেউই তেলের দাম কমানোর দাবি তোলে না। একমাত্র এসইউসি আই (সি) লাগাতার ভাবে তেলের দাম কমানোর দাবি করে যাচ্ছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24



# হিমাচল প্রদেশে শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ স্মরণে সভা

হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার বনিখেতে সর্বহারার মহান নেতা ও এস ইউ সি আই (সি) -এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১১ জুন এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ জগজিৎ সিং আজাদ। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুভাষ সাহিল।

মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অনুষ্ঠানের পর, সভার প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায় এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারায় অনুশীলন সমিতিতে বাল্যবয়সে যোগদান থেকে শুরু করে একটি সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -কে গড়ে তোলা এবং সংগঠিত করার কঠিন-কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং তাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে কমরেড রায় বিভিন্ন শ্রোতাদের এই সংক্রান্ত প্রশ্নাবলির জবাব দেন। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ফিরোজ কে রোজ, শ্যাম আজনবী, কবি পূর্ণ এহসান ও এ আইএমএসএস নেত্রী কমরেড ঋতু কৌশিক। এই সভা থেকে কলকাতার সমাপনী সমাবেশে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

## বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

*কর্ণাটকে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসেই*

*বিজেপির কায়দাতেই জনগণের ওপর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে। এর প্রতিবাদে ২১ জুন বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)। দলের বাঙ্গালোর উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভি গণমূর্তি এবং দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড এমএন শ্রীরাম বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। দলের কর্মীরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। গ্রাহক সংগঠন গড়ে তুলে ফিক্সড চার্জ ও স্ল্যাব প্রথার মাধ্যমে বাড়তি টাকা আদায় প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।*

# লেনিন পার্কে জঞ্জালের গাড়ি রাখার প্রতিবাদ

২০ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায় কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন পার্কের মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন জঞ্জাল ফেলার হাতগাড়িগুলি জমা করে রেখেছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ২২ জুন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় ও কলকাতার মেয়র ফিরাদ হাকিমকে চিঠি দিয়ে এই গাড়িগুলি অবিলম্বে সরানোর দাবি জানান এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, শুধু আমাদের দেশই নয়, পৃথিবীর সকল চিন্তাশীল মানুষ এমনকি মতপার্থক্য সত্ত্বেও মহান লেনিনকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। কলকাতা কর্পোরেশনের এমন একটা বিবেচনাহীন কাজ দেখেও পূর্ত দফতরের নিষ্ক্রিয়তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিস্মিত করেছে।

তিনি দাবি জানান, লেনিনের মূর্তির চারপাশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যারা এই রকম একটা জঘন্য কাজ করল তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

*কুলতলির মৈপীঠে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে দেওয়াল লিখছেন দলের মহিলা কর্মীরা*

# হাইকোর্টের রায়ে ট্রামরক্ষার আন্দোলনের দাবিগুলিই মান্যতা পেল

২১ জুন ট্রাম সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ট্রাম কোম্পানির জমি বিক্রি করার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। কোর্ট সরকারকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থার মতো একটি হেরিটেজকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের এবং বিক্রি করা ডিপোগুলির টাকা কী কাজে লাগানো হয়েছে তা রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট আকারে আদালতে জমা দিতে হবে। এই রায়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের একের পর এক রুট বন্ধ করা ও ডিপোগুলির জমি বিক্রি করার বিরুদ্ধে ট্রাম রক্ষার দাবিতে এবং ট্রামব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) যে আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে এবং দলের সভা, মিছিল, কনভেনশন, স্বাক্ষর সংগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মহানগরীতে ট্রাম চালু রাখার পক্ষে যে প্রবল জনমত প্রকাশ পেয়েছে, হাইকোর্টের রায়ে সেই আন্দোলনের দাবিগুলিই মান্যতা পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে।

রাজ্যের তৃণমূল সরকার একের পর এক ট্রামরুট বন্ধ করেছে। ট্রামডিপোগুলির জমি বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দিয়েছে। শহরের ৫০টি রুটের মধ্যে সিপিএম শাসনেই ৩০টি রুট বন্ধ হয়েছিল। বাকি ২০টি চালু রুটের মধ্যে এখন মাত্র তিনটি রুট চালু আছে। তা-ও নামে মাত্র।

মনে রাখতে হবে, কলকাতা ট্রাম শুধু ঐতিহ্যের সাক্ষ্যই বহন করছে না, একই সাথে এটি পরিবেশ বান্ধব এবং শহরের নাগরিকদের কাছে একটি সুলভ পরিবহন মাধ্যম। তাই কোনও অজুহাতেই যাতে কলকাতা ট্রাম বন্ধ না হয়, এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং হাইকোর্টের নির্দেশমতো বিশেষজ্ঞ এবং ট্রাম রক্ষায় যাঁরা আন্তরিক ভাবে কাজ করছেন তাঁদের যুক্ত করে কমিটি গঠন করে ট্রামব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ করার দাবি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিজে এ রাজ্যের মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার গর্ব ট্রামকে রক্ষা করতে যে ভূমিকা নিলেন তার ছিটেফোঁটাও রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। হাইকোর্টের ভূমিকার পাশাপাশি সরকারের উপর জনমতের চাপ আরও বাড়াতে সব স্তরের সাধারণ মানুষকে ট্রাম রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য দলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

## ত্রিপুরায় সভা

*শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ২৫ জুন ত্রিপুরার আগরতলায় এক শিক্ষা কনভেনশন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। অ্যাডভোকেট হরকিশোর ভৌমিক, অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ, গবেষক শেখর দাস, আকাশ সরকার, অধ্যাপক তিলক চক্রবর্তী, সমাজকর্মী রমাপ্রসাদ আচার্য বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমিটির ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ডঃ অলোক শতপথি।*

# এমএসপি ঘোষণাই সার

*ছয়ের পাতার পর*

করে, তেমনই কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ জোতের মালিক এবং খাদ্যপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। তাই বিজেপি আদানি-আম্বানিদের মতো দৈত্যাকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে যেমন কৃষক স্বার্থধ্বংসকারী তিনটি কৃষি আইন নিয়ে এসেছিল, যেমন দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনেও কৃষক অবাধ লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে, আবার কৃষিনীতির বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলনকে একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের সঙ্গে বসে রফা করে নেওয়ার 'সুপারিশ' করেছিলেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। ভোট, সরকার বদল, পঞ্চায়েত দখল ইত্যাদি কোনও কিছুই কৃষক শোষণের এই প্রক্রিয়াকে বন্ধকরতে পারছে না। এটা বন্ধ করতে হলে একটা যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন জরুরি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com